পিএসএমপি ২০১৬ : গোঁজামিলে ঠাসা এক মহা দলিল

মওদুদ রহমান

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকটকে পুঁজি করে এই খাতের ওপর কতিপয় বৃহৎ দেশিবিদেশি ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব বাড়ানো আর তাদের মুনাফার আকার অবিশ্বাস্যমাত্রায় নিশ্চিত করার যে নীতিতে সরকার চলছে তারই কাগুজে প্রকাশ সরকারের পাওয়ার সেক্টর মাস্টারপ্ল্যান (পিএসএমপি) ২০১৬। এই পিএসএমপির হাজার পাতা অসংখ্য ভুল তথ্য ও বিশ্লেষণ, চালাকি, বিদেশি কোম্পানিকে কন্ট্রাক্ট দেয়ার সুপারিশ, বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর যৌক্তিকতা প্রমাণের মরিয়া চেষ্টা, উন্মুক্ত কয়লা খনন পদ্ধতির উপযোগিতা জাহিরের চেষ্টার মতো বালখিল্যতা দিয়ে ভরা। আর তার সাথে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, কয়লা আর নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে হিসাবের গরমিল। এসবেরই উন্মোচন করেছে এই প্রবন্ধ।

জ্বালানি সংকট যখন দেশে দেশে নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করছে তখন বাংলাদেশে এই সংকটকে পুঁজি করে শুরু হয়েছে নতুন ধরনের ধান্দাবাজি। বিদ্যুৎ সেক্টর ঘিরে গত কয়েক বছরে মানুষের পকেট কাটার ধারাবাহিকতায় কয়েকটি ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর মুনাফার আকার যেনতেনভাবে আরো বাড়িয়ে দিতেই যেন তৈরি হয়েছে পাওয়ার সেক্টর মাস্টারপ্ল্যান (পিএসএমপি) ২০১৬! এই পিএসএমপির হাজার পাতার বয়ানের অসংখ্য ভুল বিশ্লেষণ, ছলচাতুরী, বিদেশি কোম্পানিকে কন্ট্রাক্ট দেয়ার সুপারিশ, বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর যৌক্তিকতা প্রমাণের মরিয়া চেষ্টা, উন্মুক্ত কয়লা খনন পদ্ধতির উপযোগিতা জাহিরের চেষ্টার মতো বালখিল্যতাকে নিশ্চিতভাবেই ছাড়িয়ে গেছে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, কয়লা আর নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে উল্লেখ করা হিসাবের গরমিল। এই গরমিল এতটাই ভয়ংকর যে এই পিএসএমপিকে একটা দেশের বিদ্যুৎ সেক্টরের মাস্টারপ্ল্যান না বলে কোনো কোম্পানির অসৎ অ্যাকাউন্ট্যান্টের গোঁজামিলে পূর্ণ হিসাবের খাতা বলাই ভালো। কয়লা আর নিউক্লিয়ার বিদ্যুতের উপযোগিতা জাহির করে খরচের শ্বেতহস্তী নামে পরিচিত এইসব প্রজেক্টের বিপরীতে একই পিএসএমপির শুরুতে এক ধরনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে বর্ণনা আরম্ভ করে পরবর্তীতে কয়েক গুণ বেশি ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তার রায় দিয়ে শেষ করার উদ্দেশ্য নানাভাবে পাঠ করা যায়। কিন্তু এই আলোচনা মূলত নবায়নযোগ্য জ্বালানি, কয়লা এবং নিউক্লিয়ার ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের উল্লিখিত হিসাবের গরমিল উদ্‌ঘাটনেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

পিএসএমপিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিয়ে বিভ্রান্তি

পিএসএমপির ১-৪৯ পাতায় ২০৪১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি ব্যবহারের যে রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে, সেখানে নবায়নযোগ্য আর আমদানি করা বিদ্যুৎকে একে অপরের বিকল্প হিসেবে জাহির করে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ১৫ শতাংশ এখান থেকে আসবে বলে লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে[১]। ১১-১২ নম্বর পাতা থেকে জানা যায় যে ২০৪১ সালে বিদ্যুতের মোট চাহিদা হবে বছরে ২ লাখ ৩৬ হাজার গিগাওয়াট আওয়ার (সম্ভাব্য পিক লোড হবে প্রায় ৫১ হাজার মেগাওয়াট)। সেই সাথে ১-৬১ পাতায় উলেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা নাকি বছরে মাত্র ৭ হাজার ১০ গিগাওয়াট আওয়ার! অর্থাৎ এখন থেকে দুই যুগ পরেও বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ সংস্থান হবে সর্বোচ্চ ৩ শতাংশ! নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে কেন্দ্র করে দেশে দেশে জ্বালানি স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের এই কালে এসে এই সেক্টরকে আর কোনো দেশের মাস্টারপ্ল্যানের পক্ষেই হয়তো বা এর চেয়ে আর ছোট করে দেখানোর নজির নেই।

অপরদিকে ১-৬৩ নম্বর পাতায় বলা হয়েছে, ২০৪১ সালের মধ্যে ভুটান ও নেপাল থেকে আমদানি করা বিদ্যুতের ক্ষমতা মোট উৎপাদনক্ষমতার ১০ শতাংশ হওয়া উচিত। সেই সাথে ১-৬৪ পাতায় ২০৪১ সালের মধ্যেই আমদানি করা বিদ্যুৎ ক্ষমতা ৯ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ওই সময়ে নির্ধারিত মোট উৎপাদিত লক্ষ্যমাত্রার (৫৬ হাজার মেগাওয়াট) ১৬ শতাংশ। অর্থাৎ এই পিএসএমপির রূপরেখা এমনভাবেই সাজানো হয়েছে যে বিদেশ নির্ভরতা বাড়িয়ে বিদ্যুৎ আমদানির বেঁধে দেয়া লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারলেই সরকার অসীম সম্ভাবনার দেশীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে! অথচ ১-৬১ পাতায় ২০২১ সালের মধ্যেই মোট উৎপাদন ব্যবস্থার ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক হওয়ার বাধ্যবাধকতা উলেখ করা হয়েছে, যা অনুসারে ২০২১ সালের মধ্যেই নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা কমপক্ষে ২ হাজার ১০০ মেগাওয়াট হওয়ার কথা।

পিএসএমপিতে কয়লা নিয়ে বিভ্রান্তি

পিএসএমপির ১-৫৩ পাতায় বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি সংস্থানে ২০৪১ সালের মধ্যে ৩৫ শতাংশ কয়লার ব্যবহারকে সবচেয়ে উপযোগী বিকল্প হিসেবে জাহির করা হয়েছে। ১১-৩৩ পাতা থেকে জানা যায় যে পরিকল্পনা অনুসারে ২০৪১ সালের মধ্যে কয়লাভিত্তিক উৎপাদনক্ষমতা হবে প্রায় ১৯ হাজার মেগাওয়াট, যা সেই সময়কার মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতার ৩৪ শতাংশ। পিএসএমপিতে 'এনার্জি ইফিশিয়েন্সি'র কথা বলা হলেও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবহৃত প্রযুক্তির জন্য কোনো ন্যূনতম মানের উল্লেখ নেই। এ কারণে এই আলোচনায় রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রকাশিত পরিবেশগত সমীক্ষা রিপোর্টের (ইআইএ) ২৯০ পাতায় উল্লিখিত সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তির ৩৫ থেকে ৪৫ শতাংশ কর্মদক্ষতার সীমা এবং ৪১২ পাতায় উল্লেখ করা ৮৫ শতাংশ ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর বিবেচনায় নিয়ে প্রতি টন কয়লায় অন্তর্নিহিত শক্তি (নেট ক্যালরিফিক ভ্যালু) ২৫ গিগাজুল/টন ধরে হিসাব করলে বছরপ্রতি প্রয়োজনীয় উৎপাদনক্ষমতার নিম্নোক্ত টেবিল পাওয়া যায়।

ছক-১ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে হাজার কোটি টাকা খরচের একেকটা প্রজেক্ট যেনতেনভাবে করে ফেলার যে তোড়জোড় বর্তমানে চলছে তা সরকারের সদ্য প্রণীত এই রূপরেখার মাধ্যমে ভবিষ্যতে আরো প্রকট হতে চলছে। তা না হলে শুধুমাত্র এক সেক্টরেই ৭ হাজার মেগাওয়াটের বাড়তি প্রকল্পের হিসাব কী করে একটা মাস্টারপ্ল্যানে দেয়া সম্ভব! নাকি সম্ভাব্য কয়লাভিত্তিক পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ আর কয়লা জোগানের সিন্ডিকেটের কমিশনের ভাগ এই পিএসএমপি প্রণেতাদের পকেটেও ঢুকেছে?

ছক-১ : কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সক্ষমতা নির্ধারণ করা হিসাবে গরমিল

সাল	পিএসএমপি নির্ধারিত ৩৫% বিদ্যুৎ কয়লা থেকে মেটাতে প্রকৃত প্রয়োজনীয় উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	পিএসএমপিতে উল্লিখিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি স্কেলের কর্মদক্ষতায় ৩৫% বিদ্যুৎ কয়লা থেকে উৎপাদনে বছরপ্রতি প্রকৃত প্রয়োজনীয় কয়লা (মিলিয়ন টন)	আলট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি স্কেলের কর্মদক্ষতায় ৩৫% বিদ্যুৎ কয়লা থেকে উৎপাদনে বছরপ্রতি প্রকৃত প্রয়োজনীয় কয়লা (মিলিয়ন টন)	সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি স্কেলের কর্মদক্ষতায় পিএস এমপিতে উলিখিত উৎপাদন কেন্দ্র ৮৫% ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টরে চললে প্রয়োজনীয় কয়লা (মিলিয়ন টন)
২০২০	৭৮০	৬০০০	২.৩১	১.৫	১৭.৭
২০২৫	১৭৬৫	৬৫০০	৪.৯৪	৩.৪	১৮.২
২০৩০	৩৫১১	৯০০০	৯.৩১	৬.৮	২৪
২০৩৫	৬৫১৫	১২০০০	১৬.৪৪	১২.৭	৩০.৩
২০৪১	১১৭৭৭*	১৯০০০	২৮.০৬	২৩	৪৫.৩

* নমুনা হিসাব টীকা আকারে যুক্ত করা হলো

পিএসএমপিতে নিউক্লিয়ার নিয়ে বিভ্রান্তি

পিএসএমপির ১-৫৩ পাতায় ২০৪১ সালের মধ্যেই ১০ শতাংশ বিদ্যুৎ নিউক্লিয়ার ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ১১-১২ নম্বর পাতায় ২০৪১ সালের মধ্যে বিদ্যুতের মোট চাহিদা বছরে ২ লাখ ৩৬ হাজার গিগাওয়াট আওয়ার হবে বলে উলেখ করা হয়েছে। ৫.১৭ শতাংশ সঞ্চালন এবং বিতরণ অপচয় ধরে হিসাব করলে (যা ২০০৭ সালেই অর্জন সম্ভব হয়েছিল) মোট উৎপাদন হতে হবে বছরে প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার গিগাওয়াট আওয়ার[২]। পিএসএমপিতে উলিখিত লক্ষ্য অনুসারেই নিউক্লিয়ার থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রয়োজন ২৫ হাজার গিগাওয়াট আওয়ার। লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে প্রকৃত প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ কেন্দ্র আর পিএসএমপিতে উলিখিত উৎপাদন কেন্দ্রের ক্ষমতা টেবিল-২-এ উল্লেখ করা হলো।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, বিদ্যুৎ সংকটের সমাধান এখানে মূল উদ্দেশ্য নয়। বাড়তি একেকটা শ্বেতহস্তী খরচতুল্য কয়েক লাখ কোটি টাকার প্রজেক্ট যেনতেনভাবে হিসাব মিলিয়ে পিএসএমপিতে অন্তর্ভুক্ত করে সেই অপচয়ের বৈধতা দেয়াই এখানে প্রধান লক্ষ্য।

ছক-২ : লক্ষ্যমাত্রা পূরণে প্রকৃত প্রয়োজনীয় নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সরকারের টার্গেট

সাল	১০% চাহিদা পূরণে ৯০% ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর ধরে প্রকৃত প্রয়োজনীয় নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র (মেগাওয়াট)	পিএসএমপি নির্ধারিত টার্গেট (মেগাওয়াট)
২০২৫	১৯২	২৪০০
২০৩০	৬৫৩	৩৪০০
২০৩৫	১৫১৮	৪৮০০
২০৪১	৩১৭৮	৭০০০

কমিশনের টাকার সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করলেই কেবলমাত্র উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষম এবং অভিজ্ঞ দেশগুলো থেকে পরিত্যাজ্য নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র ভিত্তিক উৎপাদনের টার্গেট ১০ শতাংশ হিসেবে নির্ধারণ করা যায় আর সেই ১০ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে দ্বিগুণেরও বেশি ক্ষমতার হিসাব দেখানো যায়! অতি গুরুত্বপূর্ণ এই দলিল প্রণয়নকালে নিছক ভুলবশত হিসাবের এমন সব মারাত্মক গরমিল হয়ে গেছে–এমনটা বিশ্বাস করা কঠিন।

পিএসএমপির আরো কিছু অসংগতির নমুনা

* ২০২১ সালের মধ্যেই সবার জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করার পরিকল্পনা বর্ণনা করা হয়েছে (পৃ. ১-৭৩, ১৫-৫৩)। কিন্তু এই বিদ্যুৎ মানসম্পন্ন হবে কি না, সুলভ হবে কি না, সার্বক্ষণিকভাবে সরবরাহ হবে কি না তা বলা হয়নি। অথচ জাতিসংঘ ঘোষিত সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের (এসডিজি) মানসম্পন্ন, সাশ্রয়ী জ্বালানি সকলের জন্য নিশ্চিতকরণের ৭ নম্বর পয়েন্ট উল্লেখ করে পিএসএমপির সাথে এসডিজির যোগসূত্র স্থাপনের কথা বলা হয়েছে (পৃ. ১-৬)। সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় থাকা গ্রিড কানেক্টেড বিদ্যুৎ গ্রাহককে ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী সোলার হোম সিস্টেম ব্যবহারকারীর সাথে মিলিয়ে দেখানোর কোনো যৌক্তিকতা নেই। অথচ এখানে শতভাগ বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী মানুষের টার্গেট পূরণের হিসাব মেলাতে এই দুটি ভিন্ন ক্যাটাগরির গ্রাহককে মিলিয়ে দেখানো হয়েছে এবং গ্রিড ও সোলার হোম সিস্টেম ব্যবহারকারী দুই শ্রেণির গ্রাহক মিলিয়ে বড় আকারের সংখ্যা উপস্থাপন করতে ১-৭৩ পাতায় এক অভিনব সূত্র উপস্থাপন করা হয়েছে!

* রিপোর্টের ১৫-৫৫ নম্বর পাতায় ২০৩১ সালের মধ্যে সকলকে গ্রিডের আওতাভুক্ত করার পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে গ্রিডের বাইরে থাকা প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পেতে সোলার হোম সিস্টেম ব্যবহার করছে <http://idcol.org/home/solar>। এরই মধ্যে প্রায় ৪১ লাখ সোলার হোম সিস্টেম বসানো হয়েছে, ২০৩১ সাল পর্যন্ত যা ধারাবাহিকভাবে বাড়তে থাকবে। বাড়তি টাকা খরচ করে

এই সোলার হোম সিস্টেম ব্যবহার করছে প্রধানত নিম্ন আয়ের প্রান্তিক মানুষ। গ্রিড সংযোগ না দিয়ে তাদেরকে সোলার হোম সিস্টেম কিনতে বাধ্য করার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং নানা কর্মসূচির মাধ্যমে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এর ফলে ২০৩১ সাল নাগাদ সোলার হোম সিস্টেমের সংখ্যা কোটি ছাড়িয়ে যাবে। অথচ এর মধ্যে হাজার কোটি টাকা খরচ করে বসিয়ে ফেলা সৌর সিস্টেমগুলো নেট মিটারিং সিস্টেম কিংবা অন্য কোনো উপায়ে ধরে রাখার কথা না বলে ২০৩১ সালের পর সব সোলার হোম সিস্টেম বাতিল করে দেয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে (পৃ. ১৫-৫৬)। পিএসএমপিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, `Once the stable power supply from grid is achieved, millions of SHSs would be disposed.'

* পিএসএমপির ৭-১৮ পাতায় রাশিয়ার কোম্পানি গ্যাজপ্রমকে ১০টি গ্যাসক্ষেত্র উন্নয়নের দায়িত্ব দেয়ার কথা উলেখ করা হয়েছে। ড্রাফট পিএসএমপির ৮-১৮ পাতায় ঠিক এর পরের অনুচ্ছেদেই বলা হয়েছিল, রাশিয়ার কোম্পানি প্রযুক্তিগত দিক থেকে পশ্চিমের দেশগুলো থেকে পিছিয়ে রয়েছে (`Russian oil and gas exploration and drilling technology has been lagged behind the western world...')। আরো বলা হয়েছিল যে গভীর সমুদ্রে গ্যাসক্ষেত্র উন্নয়নে পাশ্চাত্য প্রযুক্তি ব্যবহারের বিকল্প নেই (`Western technology is considered inevitable for their offshore development.')[৩]। একটি কোম্পানির চরিত্র বিশ্লেষণ করে অন্য কোম্পানিকে কাজ পাইয়ে দেয়ার এমন কদর্য সুপারিশ হয়তো বা পরবর্তীতে পিএসএমপি প্রণেতাদের কাছেও ভালো লাগেনি, তাই চূড়ান্ত রিপোর্টে এই অনুচ্ছেদটি মুছে ফেলা হয়েছে।

* তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে বিদেশি কোম্পানির জন্য 'আকর্ষণীয়' (attractive) প্যাকেজ ঘোষণার সুপারিশ এসেছে (পৃ. ৭-৩১)। অথচ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্সের সক্ষমতা বাড়ানোর কথা আসেনি। পিএসসিতে (PSC) বিদেশি কোম্পানির জন্য যে আকর্ষণীয় টার্ম যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে, সেখানে বাংলাদেশের স্বার্থরক্ষার নিশ্চয়তার বিধান যুক্ত করার কথা বলা হয়নি।

* আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমেই দাম বাড়তে থাকা এলএনজি ২০১৮ সালের মধ্যে দিনপ্রতি ৫০০ মিলিয়ন কিউবিক ফিট (mmscfd) আমদানির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, ২০২৩ সালে যা বেড়ে দাঁড়াবে ১০০০ mmscfd-তে। ২০২৭ সালের মধ্যে নতুন করে আরো ৫০০ mmscfd এলএনজি আমদানির লক্ষ্য চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং ২০৪১ সাল নাগাদ মোট এলএনজির আমদানি ৪০০০ mmscfd পর্যন্ত বাড়বে বলে বলা হয়েছে। অর্থাৎ এলএনজি আমদানির অবকাঠামো তৈরিতে মোটা অঙ্কের বিনিয়োগ প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও এবং অস্থিতিশীল আন্তর্জাতিক এলএনজির বাজার বিবেচনায় নিয়েও এলএনজি আমদানির ওপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে (পৃ. ৮-১)।

* অপরদিকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের সম্ভাব্যতাকে একেবারেই নাকচ করে দেয়া হয়েছে। এখানে বড় অঙ্কের সংখ্যা দেখাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ আর আমদানি করা বিদ্যুৎকে এক করে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না (পৃ. ১-৪৯)। অথচ একই রিপোর্টের ১৩-১ পাতায় তেল এবং গ্যাসভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহারের দাম প্রতি ইউনিটে ৪০শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে বায়ুবিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রযুক্তি ব্যবহারের দাম ইউনিটপ্রতি ৩০ শতাংশ এবং সৌরশক্তি ব্যবহারের প্রযুক্তির দাম ইউনিটপ্রতি ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে বলে উল্লেখ করা হলেও অজানা কারণে ভবিষ্যতে যে জ্বালানির দাম বেড়ে যেতে পারে সেই জ্বালানি ব্যবহারকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে আর বিশ্বজুড়ে যে জ্বালানি ব্যবহার জনপ্রিয় হচ্ছে এবং দাম কমে যাবে বলে স্বীকার করা হয়েছে সেই জ্বালানি ব্যবহার অগ্রাহ্য করা হয়েছে। একই রিপোর্টে ভারতের ক্রমবর্ধমান নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের প্রাধান্য বোঝাতে ১৩-২ পাতায় ২০২২ সালের মধ্যেই নতুন ১ লাখ মেগাওয়াট সক্ষমতার সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার আয়োজন উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের জন্য এমন ধরনের কোনো লক্ষ্য নির্ধারণের তাগিদ দেখা যায়নি।

* ২০১০ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত মাত্র ৬ বছরে ১.৬ গুণ যানবাহন বেড়েছে (পৃ. ৬-২৭)। এর মধ্যে শুধুমাত্র ঢাকায়ই যানবাহনের সংখ্যা পুরো দেশের মোট যানবাহনের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ আর ব্যক্তিমালিকানাধীন গাড়ির উল্লিখিত প্রায় পুরো পরিসংখ্যানই রয়েছে ঢাকার উচ্চ কিংবা উচ্চমধ্যবিত্তদের দখলে। গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে না উঠে ব্যক্তিমালাকানাধীন গাড়ি বাড়তে থাকা আর যোগাযোগ ব্যবস্থার বেহাল দশার কারণে শহরাঞ্চলে ট্রাফিক জ্যাম নিরসনের বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে ২০২০ সালের পর থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থায় যানবাহনের সংখ্যা অধিক হারে বাড়তে থাকবে বলে ৬-৩১ পাতায় উলেখ করা হয়েছে। এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় জ্বালানি ব্যবহার ২০১৩ সালের তুলনায় ১৮ গুণ পর্যন্ত বেড়ে যাবে বলে ৬-৩২ পাতায় উলেখ করা হয়েছে অথচ বিকল্প উপায়ে এই চাপ কমানোর ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেয়া হয়নি।

* পিএমএমপির ১-৬১ পাতায় বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক উৎপাদন সম্ভাব্যতা দেখানো হয়েছে ৩৬৬৬ মেগাওয়াট, যা সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং কল্পনাপ্রসূত। আবার ঠিক এর পরের পাতায়ই ২০৪১ সালে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক উৎপাদন সক্ষমতা ৩৮৬৪ মেগাওয়াট হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ একই রিপোর্টে উল্লিখিত উৎপাদনক্ষমতা সর্বোচ্চ উৎপাদন সম্ভাব্যতা ছাড়িয়ে যাবে বলে গালগল্প শোনানো হয়েছে।

* পিএসএমপির ১-৯৩ পাতায় বর্তমান বাসাবাড়িতে গ্যাসের দামকে খুবই কম বলে উলেখ করা হয়েছে। আসছে দিনগুলোতে উচ্চমূল্যের এলএনজির সাথে দাম সমন্বয় করতে দাম বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে, তা না হলে সরকারের ভর্তুকি দিতে হবে বলে উলেখ করা হয়েছে। অথচ রেন্টাল-কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে ২০০৯-১০ থেকে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত শুধুমাত্র তেল জোগান দিতে গিয়েই বিপিসিকে ১০ হাজার ৯০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দেয়া হয়েছে আর উচ্চমূল্যের বিদ্যুৎ কিনে গ্রাহক পর্যায়ে সরবরাহ করতে ওই সময়কালে ভর্তুকি দিতে হয়েছে ৪০ হাজার কোটি টাকা (সূত্র : বিপিডিবি বাৎসরিক প্রতিবেদন ২০০৯-১০ থেকে ২০১৪-১৫)। এই উচ্চ ভর্তুকি দিয়ে চলা বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো বন্ধ করে সাশ্রয়ী উপায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করে সরকারের ভর্তুকি কমানোর কথা বলা হয়নি, এ খাত সংশিষ্ট দায়মুক্তি আইন বাতিল করে সকল প্রক্রিয়া স্বচ্ছ করার কথা বলা হয়নি। অথচ সাধারণ মানুষের সুলভে গ্যাস ব্যবহারকে বাধাগ্রস্ত করতে দাম বাড়ানোর পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

* ১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের প্রকৃত সরকারি বিক্রয়মূল্য ৭৫০ টাকা হলেও বেসরকারি পর্যায়ে তা ১৪০০ টাকা পর্যন্ত রাখা হচ্ছে বলে ১০-১৩ পাতায় উলেখ করা হয়েছে। এলপিজির চাহিদা বছরপ্রতি ৩৫

শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০৪১ সালে ২০১৬ সালের তুলনায় ১৫ গুণ হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ অনিয়ন্ত্রিত বাজারে ইচ্ছামতো মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টি উলেখ করেও অত্যধিক চাহিদাকালীন সময়ে এলপিজির মূল্য কিভাবে নির্ধারিত হবে, কে মনিটর করবে–এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কিছু বলা হয়নি।

* ২১-১৫ পাতায় অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, কানাডা, বেলজিয়াম, সিঙ্গাপুরসহ জিডিপিতে শীর্ষ সারির দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দামের তুলনা করে দাম বাড়ানোর পরামর্শ এসেছে।

* উচ্চমূল্যের এলএনজি আমদানি হার ৪০০০ mmscfd পর্যন্ত বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। অথচ মার্চ ২০১৭ তারিখেই গ্যাস রপ্তানির সুযোগ রেখে কোরীয় কোম্পানি পোসকো দাইয়ুকে গ্যাস অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে[৪]।

গোঁজামিল, বিদেশি কোম্পানির দালালি আর গালগল্পে ঠাসা এই পিএসএমপি ২০১৬-কে সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সেক্টরের উন্নয়নের রূপরেখা বলে প্রচার করা হলেও এটা প্রকৃত অর্থে লুটপাটের আখড়ায় পরিণত হওয়া অতি গুরুত্বপূর্ণ এই সেক্টরের গোদের ওপর ভবিষ্যৎ বিষফোড়ার অশনিসংকেত। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে জ্বালানি ব্যবস্থাপনায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হলে এই সংকেত পাঠ জরুরি।

মওদুদ রহমান: প্রকৌশলী, গবেষক
ইমেইল: mowdudur@gmail.com

তথ্যসূত্র

১) Power Division of Ministry of Power Energy and Mineral Resources of Bangladesh Government, Power Sector Master Plan 2016, 2016.

২) World Bank, Electric power transmission and distribution losses (% of output), http://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.LOSS.ZS?locations=BD, April 14, 2017

৩) Power Division of Ministry of Power Energy and Mineral Resources of Bangladesh Government, Power Sector Master Plan 2016 Draft Final Report , 2016.

৪) রপ্তানির সুযোগসহ কাজ পাচ্ছে পোসকো দাইয়ু, Daily Banik Barta, March 14, 2017

টীকা

* পিএসএমপির ১১-১২ পাতা থেকে জানা যায় যে ২০৪১ সালে বিদ্যুতের চাহিদা হবে প্রায় ২ লাখ ৩৭ হাজার গিগাওয়াট আওয়ার কিংবা ২৩৭ বিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার। ৫.১৭ শতাংশ সঞ্চালন এবং বিতরণ অপচয় ধরে হিসাব করলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজন হবে ২৫০.৫৫ বিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার। পিএসএমপিতে ২০৪১ সালের মধ্যে ৩৫ শতাংশ বিদ্যুৎ কয়লা থেকে উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই হিসাবে কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজন হবে ৮৭.৬৯ বিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার। ৮৫ শতাংশ ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর ধরে হিসাব করলে নিম্নোক্ত ফল পাওয়া যায় :

ক=বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষমতা (কিলোওয়াটে)
অতএব, ক=১১৭৭৬৭৯৩ কিলোওয়াট কিংবা ১১৭৭৭ মেগাওয়াট

$$(৮৫)\% = \frac{৮৭.৬৯ \times ১০^{৯} \text{ কিলোওয়াটঘন্টা}}{\text{ক} \times ২৪\text{ঘন্টা} \times ৩৬৫ \text{ দিন}}$$

সুন্দরবন আন্দোলন : সমর্থনকে সক্রিয়তায় পরিণত করতে হবে

৪৫ পৃষ্ঠার পর

৮৫ বছরের আরেক বৃদ্ধ যখন জাতীয় কমিটির সদস্যসচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদকে ফোন করে বলেন যে তাঁর চলাফেরার শক্তি নেই, নয়তো তিনি সার্বক্ষণিকভাবে সুন্দরবন রক্ষার আন্দোলনে সক্রিয় থাকতেন, তখন সেকথা শোনার পর যাদের চলাফেলার শক্তি আছে তাদের পক্ষে কী করে স্থির বসে থাকা সম্ভব? যারা তরুণ তাদের পক্ষে কী করে এরপরও নীরব থাকা সম্ভব?

তরুণরা আসলে নীরব নেই। তরুণরা এই আন্দোলনের প্রাণ এবং সংগঠিত শক্তি। সরকার এই তারুণ্যের তেজকে ভয় পায়। আর তাই বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একটি প্রকল্পের পক্ষে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপনী সংস্থা ভাড়া করে টিভিতে বিজ্ঞাপন দিতে হয়েছে, যে বিজ্ঞাপনের মূল টার্গেট হলো তরুণরা। কেন সরকার তরুণদের টার্গেট করে এই বিজ্ঞাপনগুলো বানাচ্ছে? কারণ সরকার খুব ভালো করে জানে যে এদেশের তরুণরা সর্বনাশা রামপাল প্রকল্প ঠেকিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখে। কারণ সরকার খুব ভালো করে জানে যে এদেশের তরুণরা একজোট হয়ে দলে দলে রাস্তায় নেমে পড়লে (যার খুবই জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে) সুন্দরবন ধ্বংস করে রামপাল প্রকল্প বানাবার নীলনকশা বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা দুনিয়ার কোনো শক্তিরই থাকবে না। আর তাই তাদের এত ভয়।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে–সরকার যাদের শক্তিকে ভয় পায়, সেই তরুণদের সব অংশ কি তাদের নিজেদের শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারছে? বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে পরিচালিত বিভিন্ন জরিপ ও গণভোটের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে ৯০-৯৫ শতাংশ মানুষ রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র চায় না। তাহলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের সেইসব হাজার হাজার শিক্ষার্থী, যারা রামপাল চায় না বলছে, তারা এখনো কেন রাস্তায় নামছে না? আন্দোলনকারীদেরও কিছু সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে, এবং সেটা রয়েছেও। কিন্তু সেদিকে আঙুল তুলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই! প্রতিটি যুগেই ইতিহাস সেকালের মানুষের সামনে কতগুলো বিশেষ কর্তব্যের আহ্বান দাঁড় করায়। যারা সেই আহ্বানে সাড়া দিতে পারে, তারাই সে যুগের বীর ও সারথি। বর্তমান সময়ে ইতিহাস বাংলাদেশের মানুষের সামনে সুন্দরবন রক্ষার মহাকর্তব্য হাজির করেছে। রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিরোধী যেসব তরুণ এখনও রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলায় অংশ নিচ্ছে না, কিংবা বাংলাদেশের ফুসফুস সুন্দরবনকে বাঁচাতে নিজেরা নিজেদের মতো করে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে না, তাদের এখন ভাবার সময় হয়েছে যে শুধু 'পূর্ণ সমর্থন আছে' বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলেই কি ইতিহাস আমাদের মুক্তি দেবে? অর্জন করা যাবে কি আগামী প্রজন্মের চোখে চোখ রেখে কথা বলার যোগ্যতা? সুন্দরবন রক্ষার দায় আমাদের সবার। সুন্দরবন রক্ষার আন্দোলনে তাই শুধু সমর্থন যথেষ্ট নয়, চাই লাখ লাখ সমর্থকের সক্রিয়তাও।

মাহতাব উদ্দিন আহমেদ: সাংবাদিক, গবেষক।
ইমেইল: m21ahmed@gamil.com